প. বাজোভ

রূপোলী খুর

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

রূপোলী খুর

ককভানিয়া নামে আমাদের গ্রামে এক বুড়ো থাকতো।

সংসারে কেউ তার ছিল না, তাই সে ভাবলো তার ঘরে কোনো একটি অনাথ বাচ্চাকে পুষ্যি নেবে বলে।

প্রতিবেশীদের সে জিগগেস করলো যে সে রকম কাউকে তারা চেনে কি না। তাকে তারা বললো, 'গ্লিন্‌কাতে খুব বেশী দিন আগে নয় গ্রিগরি পতোপায়েভ-এর বাচ্চারা অনাথ হয়েছে। বড় মেয়েদের পেয়াদা দর্জি ঘরের কাজে পাঠিয়েছে। কিন্তু ছ'বছরের একটি মেয়ে আছে, তাকে কেউ চায় না। তাকে তুমি পুষ্যি নাও।'

ককভানিয়া কিন্তু বললো, 'মেয়ে নিয়ে আমার অসুবিধে। ছেলে হলে ভালো হতো। আমার কাজ তাহলে তাকে শেখাতাম আর সেও বড় হয়ে আমাকে সাহায্য করতো। কিন্তু মেয়ে আমার কী করবে? কী তাকে শেখাবো?'

তারপর কিন্তু আবার সে সব কথা ভাবলো। বললো, 'গ্রিগরি আর তার ভালোমানুষ বৌটিকেও আমি চিনতাম। তারা ছিল খুব কাজের আর সত্যিকারের হাসি খুসি লোক। মেয়েটা যদি তাদের মত হয় তাহলে কুঁড়েটা একঘেয়ে হবে না। তাকেই আমি নেবো। কিন্তু সে যদি আসতে না চায়?'

প্রতিবেশীরা তাকে বললো, 'এখনো সে খুব সুখে নেই। গ্রিগরি'র বাড়ীটাকে এক হতভাগাকে দিয়ে পেয়াদা বলেছে মেয়েটা যতদিন না বড় হয় তার দেখা শোনা করতে। নিজেরই তার গোটা দশ ছেলে মেয়ে। কেউই তারা পেট ভরে খেতে পায় না। আর অনাথা মেয়েটা এক দানা কিছু মুখে তুললেই তার বৌ গজ-গজ করে। ছোট হলেও বোঝবার মত বয়েস তার হয়েছে। এতে সে কষ্ট পায়। তুমি কি মনে করো না, এ সব থেকে সে রেহাই পেতে চায়? আর তার সঙ্গে খানিক গল্প করো তাহলেই তোমাকে সে ভালোবাসবে।'

ককভানিয়া বললো, 'ঠিক কথা। তার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলবো।'

পরের বার ছুটী যখন এলো অনাথা মেয়েটি যেখানে থাকতো সেখানে সে গেল, সে দেখলো বাড়ীটা ছেলে বুড়োয় ভরে গেছে। বাচ্চা একটি মেয়ে উনুনের পাশে বসে খয়েরি রঙের একটি বেড়ালকে আদর করছিল। মেয়েটা ছোট, বেড়ালছানাটাও। সেটা এতো রোগা আর রোঁয়া ওঠা যে তাকে বাড়ীর মধ্যে লোকে যে ঢুকতে দিয়েছে সেটাই আশ্চর্য্য। মেয়েটা তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল আর বেড়ালটা এমন গরগর করছিল যে কুঁড়ের সবখান থেকেই তা শোনা যায়।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ককভানিয়া জিগগেস করলো, 'এই কি গ্রিগরির মেয়ে?'

গিন্নি বললো, 'হ্যাঁ, সেই। তাকে গেলানো-কোটানোই যেন যথেষ্ট নয়, তার ওপর একটা ঘেয়ো বেড়ালকে জুটিয়েছে। এটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারি না। তাছাড়া বাচ্চাদের এটা আঁচড়ায়। তা সত্ত্বেও এটাকে আবার খাওয়াতে হয়।'

ককভানিয়া গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার বাচ্চারা নিশ্চয়ই এটার পেছনে লাগে। কিন্তু মেয়েটি আদর করলেই ওটা আনন্দে গরগর করে।' তারপর মেয়েটার দিকে ফিরে সে বললো, 'ভালো কথা, পদারিয়ঙ্কা, আমার বাড়ীতে এসে থাকবে?'

মেয়েটা বড় বড় চোখ তুলে তাকালো।

'কী করে জানলে আমাকে দারিয়ঙ্কা* বলে লোকে ডাকে?'

---

* পদারিয়ঙ্কা — উপহার

সে বললো, 'এমনি মনে হলো। আমি জানতামও না, ভাবিও নি, নামটা হঠাৎ মনে পড়লো।'

মেয়েটা জিগগেস করলো, 'কিন্তু তুমি কে?'

ককভানিয়া বললো, 'আমি শিকার-টিকার করি। গ্রীষ্মকালে বালি ধুয়ে সোনা খুঁজে বেড়াই, কিন্তু শীতকালে বনের মধ্যে গিয়ে খুঁজি ছাগল—তার কিন্তু দেখা মেলে না।'

'সেটাকে দেখতে পেলেই কি গুলি করবে?'

ককভানিয়া বললো, 'না। সাধারণ ছাগলদের আমি গুলি করে মারি বটে কিন্তু সেটাকে মারবো না। কোথায় সামনের ডান পা'টা সে আছড়ায় দেখতে চাই।'

'কেন?'

ককভানিয়া বললো, 'আমার সঙ্গে থাকবে এসো। তার সব গল্পটা তোমায় বলবো।'

ছাগলটার বিষয়ে সব কথা বাচ্চা মেয়েটির জানতে খুব ইচ্ছে হলো। তাছাড়া সে দেখলো যে বুড়ো লোকটি আমুদে আর দয়ালু। তাই সে বললো, 'তোমার সঙ্গে যাবো। কিন্তু আমার বিল্লীটাকেও নিয়ে যেতে হবে। দেখো না, কী রকম সে ভালো।'

ককভানিয়া বললো, 'সে কথা আর বলতে! একেবারে পাঁঠা না হলে কেউ কি আর এরকম গাইয়ে বেড়ালকে ফেলে যায়। বাড়ীর বালালাইকা* হয়ে সে থাকবে।'

গিন্নি তাদের কথাবার্তা শুনলো, আর বাচ্চাটাকে নিজের ঘাড় থেকে নামাতে পারার জন্যে যতদূর সম্ভব খুসি হয়ে উঠলো। দারিয়ঙ্কার জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি সে গুছতে সুরু করলো। তার ভয় হচ্ছিল পাছে ককভানিয়া মত বদলায়।

মনে হলো বেড়ালটাও যেন সব কথা বুঝতে পেরেছে। তাদের পা'য়ে নিজের গা ঘষে সে গরগর করে উঠলো, 'এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক! তুমি এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক!'

ককভানিয়া মেয়েটিকে বাড়ীতে নিয়ে এলো। লম্বা তার চেহারা আর একমুখ দাড়ি, এদিকে মেয়েটা এক্কেবারে বাচ্চা, নাকটা তার খ্যাঁদা। তারা চললো পথ ধরে, পিছন পিছন খুঁড়িয়ে আসতে লাগলো রোঁয়া ওঠা বেড়ালটা।

ককভানিয়া দাদু, অনাথা দারিয়ঙ্কা আর বেড়ালটা এইভাবে একসঙ্গে থাকতে সুরু করলো। দিন কেটে যায়। তারা বড়লোক হলো না বটে, কিন্তু টানাটানিও নেই। তাছাড়া প্রত্যেকেরই করার মত কাজ থাকে যথেষ্ট।

---

*জনপ্রিয় তিনটি তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র

সকালবেলা ককভানিয়া কাজে বেরোয়, দারিয়ঙ্কা কুঁড়েতে ঝাঁট দেয় আর সুপ ও পরিজ বানায়, এদিকে বেড়ালটা শিকার করে ইঁদুর। সন্ধেবেলা সবাই মনের সুখে দিব্যি আরামে বাড়ীতে থাকে।

বুড়ো লোকটি চমৎকার গল্প বলিয়ে। দারিয়ঙ্কা গল্প শুনতে ভালোবাসে আর বিল্লীটা শুয়ে থেকে গরগর করে, 'এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক! তুমি এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক!'

কিন্তু প্রত্যেক গল্পের শেষে দারিয়ঙ্কা বুড়োকে মনে করিয়ে দেয়:

'দাদু, এবার সেই ছাগলটার গল্প বলো। সেটাকে দেখতে কী রকম?'

প্রথম দিকে ককভানিয়া তার প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতো, শেষে কিন্তু তাকে বললো:

'সেটা এক্কেবারে অন্য জাতের ছাগল। তার সামনের ডান পা'য়ে আছে রূপোলী খুর। আর সেই রূপোলী খুর যখনই সে ঠোকে তখনই সে ফেলে যায় একটা করে মণি। একবার ঠুকলে, থাকে একটা মণি, দুবার ঠুকলে দুটো আর ক্রমাগত পা আছড়ালে পড়ে থাকে এক রাশ।'

তাকে বলার পর বুড়ো কিন্তু অনুশোচনা করতে লাগলো, কারণ তারপর থেকে ছাগলটার বিষয় ছাড়া দারিয়ঙ্কা আর কোনো কথাই বলে না।

'দাদু, সেটা কি মস্ত ছাগল?'

ককভানিয়া তাকে বললো যে সেটা টেবিলের চেয়ে উঁচু নয়, আর পাগুলো তার সরু-সরু আর মাথাটা সুন্দর।

দারিয়ঙ্কা কিন্তু ক্রমাগত বলে চললো, 'দাদু, তার কি শিং আছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তার শিং আছে বৈকি। আর সেগুলো ভারি সুন্দর। সাধারণ ছাগলের দুটো করে শিং থাকে, কিন্তু তার শিংগুলো হরিণের মত, আর পাঁচটা ছুঁচলো ফ্যাঁকড়াওলা।'

'দাদু, সে কি মানুষ খায়?'

'না-রে, সে মানুষ খায় না, সে খায় ঘাস-পাতা। আর শীতকালে হয়তো খড়ের গাদা থেকে সামান্য খড় সে চিবোয়।'

'সেটা কী রঙের।'

'গ্রীষ্মকালে এই বিল্লীটার মত রঙ তার তামাটে, আর শীতকালে তার রঙটা হয় রূপোলী-ধূসর।'

শরৎ এলো, বনে যাবার জন্যে ককভানিয়া তৈরী হতে লাগলো। সে দেখতে চায় ছাগলগুলো কোথায় খাবার খায়। দারিয়ঙ্কা কিন্তু বায়না ধরলো।

'দাদু, তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চলো। হয়তো অনেক দূরে থাকলেও ছাগলটার দেখা আমি পাবো!'

ককভানিয়া বললো, 'অনেক দূর থেকে তুই তাকে চিনতে পারবি না। শরৎকালে সব ছাগলের মাথাতেই শিং থাকে। কটা করে ফ্যাঁকড়া আছে তুই দেখতে পাবি না। শীতকালে কিন্তু অন্য ব্যাপার। তখন সাধারণ ছাগলদের শিং থাকে না, কিন্তু 'রূপোলী খুর'এর শিং থাকে সব সময়ই। তাই দূরে থাকলেও, তাকে চেনা যায়।'

এই গল্প বলে তাকে সে কোনো রকমে শান্ত করলো। দারিয়ঙ্কা রইলো বাড়ীতে, এদিকে ককভানিয়া গেল বনে, পাঁচ দিনের দিন সে ফিরলো।

সে বললো, 'পোল্দনেভ্স্ক-এর পথে এ বছর অনেক ছাগল চরছে। শীত এলে সেখানেই আমি যাবো।'

দারিয়ঙ্কা জিগগেস করলো, 'কিন্তু শীতকালে বনের মধ্যে শোবে কোথায়?'

সে বললো, 'ঘাস কাটার সময় যে উপত্যকায় আমরা যাই তার পাশে আমার একটা ছোট্ট কুঁড়ে আছে। কুঁড়েটা বেশ মজবুত আর সেটায় একটা জানলা আর একটা উনুনও আছে। সেখানে কোনোই অসুবিধে নেই।'

দারিয়ঙ্কা আবার প্রশ্ন করতে সুরু করলো, 'সেখানেও কি 'রূপোলী খুর' চরে?'

'কে জানে? চরতেও পারে।'

তারপর মেয়েটা আবার অনুনয়-বিনয় সুরু করলো, 'দাদু, আমাকে নিয়ে চলো, কুঁড়েতে আমি থাকবো। 'রূপোলী খুর' হয়তো কাছেই আসবে। তাহলে তাকে দেখতে পাবো।'

প্রথমে বুড়ো কিন্তু কথাটা কানেই তুললো না। 'কী বললি! শীতকালে একটা বাচ্চা মেয়েকে আমি বনের মধ্যে নিয়ে যাবো! যেতে হলে তোকে স্কি করে যেতে হবে, আর তা-তো তুই জানিস না। বরফে তুই ডুবে যাবি। তোকে নিয়ে কী করবো? তুই তো জমেও যাবি।'

দারিয়ঙ্কা কিন্তু তাকে ছাড়লো না। ক্রমাগতই সে অনুনয়-বিনয় করে চললো, 'দাদু, আমায় নিয়ে চলো, আমায় নিয়ে চলো, আমি একটু একটু স্কি করতে জানি।'

ককভানিয়া নানা ভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, শেষটায় সে ভাবলো, 'আচ্ছা তাকে নিয়ে গেলেই বা কী? একবার গেলেই আর সে যেতে চাইবে না।'

সে বললো, 'আচ্ছা বেশ, তোকে নিয়ে যাবো। শুধু মনে রাখিস বনে গিয়ে তুই কাঁদতে কিম্বা বাড়ী ফেরার জন্যে বায়না করতে পাবি না।'

শীত যখন সত্যি-সত্যি এলো ককভানিয়া দু'বস্তা সেঁকা রুটি, শিকারের কিছু সরঞ্জাম আর যে সব টুকিটাকি জিনিসের দরকার সেগুলো একটা হাতে টানা শ্লেজে ভরলো। দারিয়ঙ্কাও নিজের জন্যে নিলো ছোট্ট একটা পুঁটলি। পুতুলের জামা করার জন্যে নানা কাপড়ের টুকরো, এক বাণ্ডিল সূতো আর একটা ছুঁচ এবং একটা দড়িও সে নিলো।

সে ভাবলো, এটা দিয়ে হয়তো 'রূপোলী খুর'কে ধরতে পারবো।

বেড়ালটাকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হলো, কিন্তু কী আর করা যায়? তার পিঠ চাপড়ে তার সঙ্গে সে কথা কইলো আর সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো।

'বিল্লী, দাদু আর আমি বনে যাচ্ছি, তুই এখানে থেকে সমস্ত ইঁদুরগুলো ধরিস। 'রূপোলী খুর'এর দেখা পেলে আবার আমরা বাড়ী ফিরবো আর তোকে সব কথা বলবো।'

চালাক-চালাক চোখ তুলে তাকিয়ে বিল্লী গরগর করে উঠলো, 'এক্‌কেবা-র্‌-র্‌-রে ঠিক! তুমি এক্‌কেবা-র্‌-র্‌-রে ঠিক বলেছো!'

ককভানিয়া আর দারিয়ঙ্কা বেরিয়ে পড়লো। প্রতিবেশীরা সবাই অবাক হয়ে গেল। 'বুড়োর নিশ্চয়ই ভীমরতি ধরেছে! নইলে অতটুকু মেয়েকে কেউ কখনো শীতকালে বনে নিয়ে যায়?'

ককভানিয়া আর দারিয়ঙ্কা সব শেষের বাড়ীটা ছাড়িয়ে যাবার পরেই শুনতে পেলো সব কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে ভারি হৈ-চৈ বাধিয়েছে—যেন কোনো বুনো জানোয়ার এসেছে। তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো কুকুরগুলোকে গালিগালাজ করতে-করতে বিল্লীটা পথের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে আসছে। বিল্লীটা এখন মস্ত বড় বেড়াল, নিজের ভার এখন সে নিজেই নিতে পারে। কোথাও এখন এমন একটা কুকুরও নেই যে তার সঙ্গে লড়াই করতে চায়।

তাকে ধরে দারিয়ঙ্কা বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু বিল্লীটাকে কেউ ধরবার চেষ্টা করো তো! বনের মধ্যে ঢুকে চক্ষের নিমেষে সে গাছে উঠে পড়ছে। তারপর তাকে সেখান থেকে একবার নামাতে গিয়ে দেখ! দারিয়ঙ্কা ডেকে চললো, বিল্লী কিন্তু নামলো না। অতএব কী আর তারা করে! তারা এগিয়ে চললো। আর যখনই তারা ফিরে তাকায় দেখে রাস্তার একপাশ দিয়ে তাদের কাছে-কাছে বিল্লী দৌড়ে-দৌড়ে চলেছে। এই ভাবে অবশেষে তারা সেই কুঁড়েতে এসে পৌঁছুল।

এই ভাবে একসঙ্গে তারা তিনজনে রইলো। দারিয়ঙ্কার সেটা পছন্দ হলো। সে বললো, 'এই ভাবে তিনজনে মিলে থাকাটা ভারি মজার।'

ককভানিয়াও একমত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, এই ভাবে থাকাটা আরো আনন্দের।' আর বিল্লীটাও উনুনের পাশে পাকিয়ে গোল হয়ে চেঁচিয়ে গরগর করে উঠলো, 'এক্‌কেবা-র্‌-র্‌-রে ঠিক! এক্‌কেবা-র্‌-র্‌-রে ঠিক বলেছো!'

সেই শীতকালে অনেক ছাগল দেখা গেল। সেগুলো সব সাধারণ ছাগল। প্রতিদিনই ককভানিয়া একটা কি দুটোকে বাড়ীতে আনতো। ছাগলের চামড়া জমে উঠতে লাগলো। আর তাদের মাংসগুলোকে নুন দিয়ে জারিয়ে রাখা হলো—পরিমাণে সেগুলো এতো বেশী যে হাতে টানা শ্লেজে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ককভানিয়া দেখলো একটা ঘোড়াকে নিয়ে আসার জন্যে তাকে বাড়ীতে ফিরতে হবে, কিন্তু কেবল বেড়ালের জিম্মায় দারিয়ঙ্কাকে কি করে সে বনের মধ্যে রেখে যায়? দারিয়ঙ্কার কিন্তু বনে থাকা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সে কথাটা নিজেই সে বললো।

'দাদু, একটা ঘোড়া আনার জন্যে কেন তুমি গাঁয়ে যাচ্ছো না? নুনে জরানো মাংসগুলো বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

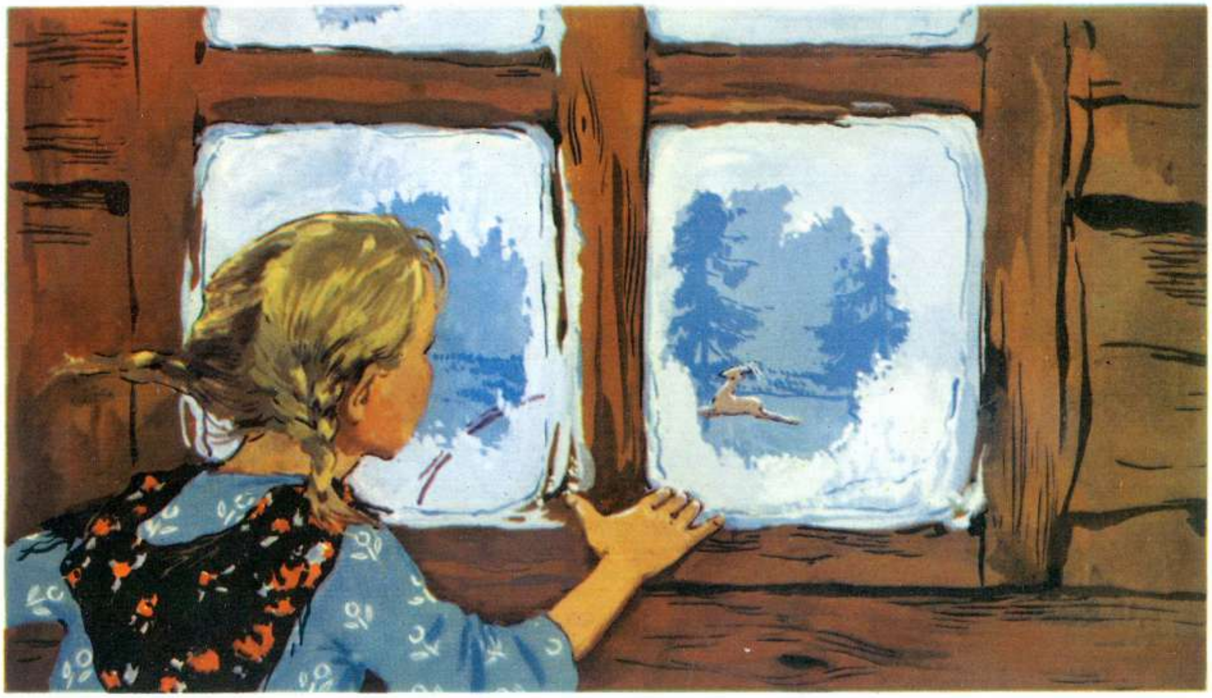

ককভানিয়া অবাক হয়ে গেল।

'ঐটুকু মাথাতে কি বুদ্ধি। ঠিক একেবারে বড় মেয়েদের মত। আমি নিজেও কথাটা ভেবেছি। কিন্তু একেবারে একা থাকতে কি ভয় পাবি না?'

উত্তরে সে বললো, 'ভয় পাবো কেন? তুমি তো নিজেই বলেছো যে কুঁড়েটা এতো মজবুত যে নেকড়েরাও ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আর তাছাড়া তারা এখানে আসেও না। বিল্লীটা তো আমার সঙ্গেই রইলো। আমি ভয় পাবো না। যাই হোক, তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!'

ককভানিয়া চলে গেল। বিল্লীর সঙ্গে একা রইলো দারিয়ঙ্কা। দিনের বেলা ককভানিয়া যখন ছাগলের পিছন-পিছন ঘুরতো তখন থেকেই একা থাকা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধে হয়ে আসতে তার কী রকম যেন গা ছমছম করতে লাগলো। বিল্লীর দিকে তাকালো সে, সেটা কিন্তু বেশ আরামে শুয়ে রয়েছে। তাই দেখে দারিয়ঙ্কার অনেকটা ভালো লাগলো। জানলার ধারে বসে বাইরের উপত্যকার দিকে সে তাকালো আর—ঐ যে ঐখানটায় বনের মধ্যে থেকে বলের মতো কি যেন একটা লাফিয়ে এলো বেরিয়ে। কাছে আসতে সে দেখলো সেটা একটা ছাগল। পাগুলো তার সরু-সরু, মাথাটাও ছোট্ট আর

সেটার ওপর রয়েছে পাঁচটা ফ্যাঁকড়াওলা শিং। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে দৌড়ে গেল দারিয়স্কা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। অনেকক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা করলো, শেষকালে বাড়ী ফিরলো, 'নিশ্চয়ই আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম', সে বললো, 'নিশ্চয়ই ওটা আমার কল্পনা।'

বিল্লী গরগর করে উঠলো, 'এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক! এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক বলেছো!'

বিল্লীটাকে নিয়ে দারিয়স্কা গেল ঘুমতে, আর সকাল পর্যন্ত ঘুমলো অসাড়ে। আরো একটা দিন কেটে গেল। ককভানিয়ার দেখা নেই। দারিয়স্কার মন খারাপ হয়ে গেল, একলা একলা লাগতে লাগলো তার, কিন্তু সে কাঁদলো না। তার বদলে সে বিল্লীটার পিঠ চাপড়াতে লাগলো।

'মন খারাপ করিস নে-রে বিল্লী', সে বললো, 'দাদু কালই আসবে, দেখিস।'

বিল্লী শুধু তার সেই একই গানটা গাইলো, 'এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক! এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক বলেছো!'

দারিয়স্কা আবার জানলার পাশে বসে তারার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ভাবছিল শুতে যাবে এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলো কুঁড়ের দেওয়ালের পিছনে খুটুর-খুটুর-খুট। ভয় পেয়ে উঠলো সে লাফিয়ে, অন্য দেওয়ালের পিছনে শোনা গেল আবার সেই খুটুর-খুটুর-খুট, তারপর শব্দটা আবার ফিরে এলো প্রথম দেওয়ালের পিছনে, তারপর দরজাটার পাশে, আর সবশেষে ছাদের উপর। শব্দটা মোটেই জোরে নয়, মনে হলো সেটা খুব দ্রুত আর হালকা পা'য়ের আওয়াজ।

হঠাৎ দারিয়স্কা মনে মনে ভাবলো, 'যে ছাগলটা গতকাল এসেছিল এটা যদি সেটাই হয়?' এতোই তার কৌতূহল জেগে উঠলো যে ভয়ও তাকে রুখতে পারলো না। দরজাটা খুলে সে উঁকি মারলো, আর ঐ যে সেই ছাগলটা, এক্কেবারে হাতের নাগালে, এক্কেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনের ডান পা'টা তুলে সে আছড়াতে গেল আর দেখা গেল তার ওপর ঝিকিয়ে উঠছে একটা রূপোলী খুর। শিংএতে তার পাঁচটা ফ্যাঁকড়া। কী করবে ভেবে পেল না দারিয়স্কা তাই সে সাধারণ ছাগলকে যে ভাবে ডাকতে হয় সেই ভাবে ডাকলো।

কী হাসিটাই না হাসলো সেই ছাগলটা! তারপর ঘুরে উপত্যকার ভিতর দিয়ে দৌড় দিল সে। কুঁড়েয় ফিরে সব কথা বিল্লীকে বললো দারিয়স্কা।

' 'রূপোলী খুর'কে আমি দেখতে পেয়েছি। দেখেছি তার শিং আর তার খুর। শুধু দেখতে পাইনি পা আছড়াবার পর কী রকম জহরৎ সে ফেলে যায়। পরের বার সেটা আমায় সে দেখাবে।'

বিল্লী তার সেই পরিচিত গান গাইলো, 'এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক! এক্কেবা-র্-র্-রে ঠিক বলেছো!'

তৃতীয় দিন কাটলো, তবুও ককভানিয়ার দেখা নেই। দারিয়ঙ্কার মুখটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। এমন কি সামান্য সে কাঁদলোও। বিল্লীর সঙ্গে সে গল্প করতে চেয়েছিল, বিল্লীটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে। তারপর দারিয়ঙ্কা সত্যি-সত্যি ভয় পেয়ে উঠে দৌড়ে বাইরে বেরুলো বিল্লীটার খোঁজে।

রাতটা অন্ধকার নয়, পুরো চাঁদটা জ্বলছে। খুঁজতে গিয়ে দারিয়ঙ্কা দেখলো— ঐ তো বিল্লীটা ওখানেই রয়েছে, এক্কেবারে কাছে। উপত্যকার উপর সে বসে রয়েছে, সামনেই সেই ছাগলটা। বিল্লীটা মাথা নাড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ছাগলটাও, মনে হয় যেন তারা কথা কইছে। তারপর তারা তুষারের উপর দৌড়ে খেলা করতে লাগলো।

ছাগলটা একবার এখানে দৌড়োয়, একবার ওখানে, তারপর থামে আর আছড়ায় তার পা। বিল্লীটা দৌড়ে যায় ছাগলটার কাছে আর ছাগলটা এক পাশে লাফ মারে আর আবার আছড়ায় তার পা।

অনেকক্ষণ ধরে উপত্যকার উপরে তারা দৌড়ে বেড়ালো, আর তারপর মিলিয়ে গেল দিগন্তে। আর তারপর আবার এক্কেবারে কুঁড়ের সামনে এসে হাজির হলো তারা। ছাগলটা কুঁড়ের ছাদে লাফিয়ে উঠে রূপোলী খুর দিয়ে আছড়াতে লাগলো তার পা'টা। আর আগুনের ফুল্‌কির মতো ঝরে পড়তে লাগলো জহরৎগুলো—লাল, সবুজ, ফিকে নীল, গাঢ় নীল সবরকম রঙের।

ঠিক তখনই ফিরলো ককভানিয়া। সে কিন্তু নিজের কুঁড়েটাকে চিনতে পারেনি। নানা জহরৎ'এ ঢেকে গেছে সেটা, সবরকম রঙে সেগুলো চমকাচ্ছে আর ঝলসাচ্ছে। আর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছাগলটা আর তার রূপোলী খুর দিয়ে আছড়ে চলেছে তার পা'টা, আর কেবল ঝরে-ঝরে পড়ছে জহরৎগুলো।

হঠাৎ বিল্লীটাও সেখানে লাফিয়ে উঠলো আর ছাগলটার পাশে দাঁড়িয়ে সজোরে গরগর করতে লাগলো—আর তারপর? কিচ্ছু নেই, না বিল্লী না 'রূপোলী খুর'।

ককভানিয়া আধখানা টুপি ভরে জহরৎ কুড়ুলো। দারিয়ঙ্কা কিন্তু অনুনয় করে তাকে বললো, 'দাদু, ওগুলো ছুঁয়ো না! সকালে ওগুলোকে কি রকম দেখায় আমি দেখতে চাই।'

সে যা বললো ককভানিয়া মানলো তাই। কিন্তু সকাল হবার আগেই দারুণ তুষার পড়ায় সব কিছু ঢেকে গেল।

পরে তারা সব তুষার সরালো, কিন্তু কিচ্ছুই দেখতে পেল না তারা। যাই হোক, ককভানিয়া তার টুপিতে যা কুড়িয়েছিল সেটাও কম নয়।

তাই সব কিছুই শেষ হলো ভালোয় ভালোয়, যদিও দুঃখের কথাটা হোলো বিল্লীর বিষয়ে। তাকে আর দেখা যায়নি, 'রূপোলী খুর'ও আর ফেরেনি। একবারই তার আসার কথা আর সেটাই যথেষ্ট।

তারপর কিন্তু লোকেরা প্রায়ই উপত্যকায় জহরৎ খুঁজে পায়, যেখানে ছুটে বেড়িয়েছিল ছাগলটা।

তাদের বেশীর ভাগেরই রঙ সবুজ, লোকেরা যাদের ক্রিসোলাইট বলে। সেগুলো তোমরা দেখেছো কী?

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ছোট শিশুদের জন্য

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়

ছবি এঁকেছেন: ম. উস্পেনস্কায়া

П. БАЖОВ

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ